বাংলা কবিতার অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ

:: সম্পাদনা ::

স্বামী শান্তেশানন্দ
ড. গোপাল চন্দ্র বাইন
ড. মনসা ঘাঁটা

রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দির
বেলুড় মঠ, হাওড়া - ৭১১ ২০২

সূচিপত্র

১. একনজরে বাংলা কবিতার সেকাল ও একাল
— **অধ্যাপক ড. অরিন্দম চট্টোপাধ্যায়** ১৩

২. রবীন্দ্রনাথের গানগুলি, কবিতার অর্গল ঠেলে
— **চৈতালী চট্টোপাধ্যায়** ১৮

৩. জীবনানন্দ দাশের কবিতায় রাজনৈতিক চেতনা
— **অধ্যাপক প্রকাশ কুমার মাইতি** ২০

৪. কবিতায় নারীর ভাষা : নারীর লেখা নারীর রাজনীতি
— **যশোধরা রায়চৌধুরী** ২৬

৫. রাহুল পুরকায়স্থর কবিতা: একটি অন্তরঙ্গ পাঠ
— **অনিতা অগ্নিহোত্রী** ৩৭

৬. কবিতার ভবিষ্যৎ, ভবিষ্যতের কবিতা — **অলোক বিশ্বাস** ৪২

৭. সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্র দখল, গুপ্ত হত্যা এবং মেঘনাদবধ কাব্য
— **ড.শুভঙ্কর রায়** ৫৪

৮. রবীন্দ্রনাথ ও সঞ্জয় ভট্টাচার্যের পত্রালাপে কয়েকটি প্রসঙ্গ
— **ড. দেবাশিস ভট্টাচার্য** ৭০

৯. নির্বাচিত রবীন্দ্র কবিতায় শ্রমজীবী মানুষ — **ড. অভি কোলে** ৭৯

১০. দিশারী মুখোপাধ্যায়ের কবিতা ও আধুনিক সভ্যতার মেকি চেহারা
— **ড. গুরুপদ অধিকারী** ৮৮

১১. ভবিষ্যৎ কবিতা : একটি প্রস্তাবনা —**জয়ন্ত পাল** ৯৭

১২. জয় গোস্বামী : 'বিষ' কাব্যে কবি-মনের ভাঙন —**ড. সুতপা ষড়ঙ্গী** ১০১

১৩. মন্দাক্রান্তা সেনের কবিতায় সমাজ ও সমকাল — **কার্তিক নাগ** ১০৮

১৪. অশোকবিজয় রাহার কবিতায় ঝর্ণার নারীরূপ :
সৌন্দর্যানুভূতি ও স্মৃতির বহুমাত্রিক প্রকাশ — **লতিকা মণ্ডল** ১১৭

১৫. জয় গোস্বামীর কবিতা: বাচ্যার্থের মুক্তি প্রসঙ্গ ও বিশ্লেষণ
— **অভিরূপ মুখার্জি** ১২৪

১৬. পিতৃতান্ত্রিক প্রাধান্য উপেক্ষা করে নারীর আত্মানুসন্ধান : কবিতা সিংহের কবিতা — **ড. রাকেশ জানা** ১৩৩

১৭. উত্তর আধুনিক কবি ভাস্কর চক্রবর্তীর কবিতা : বিষণ্ণতাবোধ ও নিঃসঙ্গতা — **মৌসুমী নন্দী** ১৪৮

১৮. নিঃসঙ্গতা, অসহায়তা, দারিদ্র্য-দুশ্চিন্তা নিয়েও কবি ভাস্কর চক্রবর্তী — **সমরেশ মণ্ডল** ১৫৭

১৯. চারণকবি বৈদ্যনাথের জীবন ও সামাজিক উদ্দেশ্যমূলক কবিতা : একটি সংক্ষিপ্ত রূপরেখা — **সুমন্ত চন্দ** ১৬৪

২০. পাঁচের দশকের কাব্যপ্রেক্ষিত ও সমরেন্দ্র সেনগুপ্তের কবিতা — **সুরেন্দ্রনাথ দে** ১৭২

২১. উৎস সন্ধানী কবি অরুণ মিত্র ও তাঁর কাব্য বলয় — **ড. অর্ধেন্দু সরকার** ১৮৩

২২. ভাস্কর চক্রবর্তীর কবিতায় নৈঃশব্দের হাতছানি — **মানিক রায়** ১৯২

২৩. বৈষ্ণব পদাবলী ও গীতিকা সাহিত্য : আভাষ ও নির্মাণ — **ড. কৌশিক মণ্ডল** ১৯৭

২৪. রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলি (ইংরেজি) এবং আচার্য শঙ্করের অদ্বৈতবাদ — **ড. অনন্যা ঘোষ** ২০৬

২৫. কবি বিবেকানন্দ ও বিরাটের উপাসনা — **তথাগত মণ্ডল** ২১৩

২৬. যুগপথিক কবি শিবনাথ শাস্ত্রী : এক ব্যর্থ প্রচেষ্টার রূপকার — **ড. শৌভিক কুণ্ডু** ২২৫

২৭. অবনী বাড়ি আছো : একটি সৃজনমূলক অনুসন্ধান — **অর্করূপ গঙ্গোপাধ্যায়** ২৩৭

২৮. ব্যক্তি মানসে কবিতা ও কবির দায়বদ্ধতা : একটি সামাজিক প্রেক্ষাপট — **মন্দিরা ঘোষ** ২৪২

২৯. সুকান্ত ভট্টাচার্যের একটি প্রতিনিধিস্থানীয় কবিতা : রানার — **ড. শীতল গঙ্গোপাধ্যায়** ২৪৯

৩০. সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের কবিতায় মানবী নীরা : প্রসঙ্গ প্রেম অপ্রেম — **ড. গোপাল চন্দ্র বাইন** ২৫৪

৩১. কবির ধর্ম — **দেবাঞ্জন চক্রবর্তী** ২৬০

৩২. কবিতা কাফেলা — **গালিব উদ্দিন মণ্ডল** ২৬৩

৩৩. পরিশিষ্ট ২৬৭

পিতৃতান্ত্রিক প্রাধান্য উপেক্ষা করে নারীর আত্মানুসন্ধান : কবিতা সিংহের কবিতা

ড. রাকেশ জানা

নারী মুক্তি আন্দোলনের পথিকৃতের মধ্যে অন্যতম হিসাবে পাঠক মহলের সমাদৃত হয়েছেন কবি, গল্পকার, ঔপন্যাসিক ও প্রথিতযশা সাংবাদিক কবিতা সিংহ (১৯৩১-১৯৯৮)। নারীর আত্মমর্যাদার লড়াই তাঁকে বিশিষ্ট করেছে। পিতৃতান্ত্রিক সমাজের একপার্শ্বিক ভাবনাকে তিনি ভাঙতে চেয়েছিলেন। তিনি কল্পনা করেছিলেন এক নতুন ভবিষ্যতের; যেখানে থাকবে না কোনো শ্রেণি, বর্ণ, লিঙ্গ নির্বিশেষে শোষণ। সাহিত্যিক নবনীতা দেবসেন কবিতার মধ্যে দেখেছিলেন নারীর 'আত্মানুসন্ধানের যন্ত্রণাময় পথ-পরিক্রমা'। তাঁর সমস্ত কবিতার শরীরে বয়ে চলেছে এক সচেতন নারীর একাকিত্ব; তবে তা কখনোই তাঁর মনকে দুর্বল করেনি। বরঞ্চ ঘুরে দাঁড়ানোর সাহস জুগিয়েছে। অন্তঃপুরের চার দেওয়াল, সাহিত্য চর্চায় সামাজিক অস্বীকৃতি, শিক্ষিত নারীর নিজস্ব ব্যথা ও দ্রোহ তাঁকে অন্যদের থেকে পৃথক ও একাকী করে তুলেছে। সমাজ সংবেদনশীল এই কবি সামাজিক বঞ্চনার বিরুদ্ধে কবিতাকে প্রতিবাদের অস্ত্র করে তোলেন। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দেখা যায় পিতৃতান্ত্রিক সমাজে মেয়েরা পণ্য ছাড়া আর কিছুই নয়, তাদের দেখা হয় কামনার দৃষ্টিতে, ভোগের সামগ্রী হিসেবে। যে সমাজ নারীমনের খোঁজ রাখে না, সেই সমাজের প্রতি দ্রোহ প্রকাশ করেছেন কবিতা— 'তাই ঘৃণা, দুই চোখ কাজল জানেনি/ নারীর শৃঙ্গার ছলা দর্পণের পায়ে পায়ে ক্লিন্ন অধীনতা/ কার জন্য এত সাজ? বক্ষ বাঁধা? নীবি?' ('আজীবন পাথর-প্রতিমা', কবিতা পরমেশ্বরী) —এখানে কবিতা সিংহ নারীর সাজগোজের মাধ্যমে সামাজিক বিধিনিষেধ ও পুরুষের মন জুগিয়ে চলার প্রথাকে তীব্র প্রশ্নবিদ্ধ করেছেন। নারীর রূপকে কবিতা নারীর মননশীল অস্তিত্বের শত্রু বলে মনে করতেন। 'অপমানের জন্য ফিরে আসি' কবিতায় পিতৃতন্ত্রকে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছেন কবিতা— "যুদ্ধরীতি পাল্টানোর কোনো প্রয়োজন নেই/ তাই করমর্দনের জন্য/ হাত বাড়াবেন না।/ আমার করতলে কোনো অলিভচিক্কণ কোমলতা নেই।"

১৬ই অক্টোবর ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দে কলকাতার ভবানীপুরে কবি, গল্পকার, ঔপন্যাসিক ও প্রথিতযশা সাংবাদিক কবিতা সিংহ জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম শৈলেন্দ্রনাথ

সিংহ ও মাতার নাম অন্নপূর্ণা সিংহ। খুব ছোটোবেলা ছয়-সাত বছর বয়স থেকেই তিনি লিখতে শুরু করেন। ছেলেবেলা থেকেই মা অন্নপূর্ণা সিংহকে কবিতা লিখতে দেখতেন। মাকে দেখেই তাঁর ছবি আঁকতেও শেখা, কিন্তু মায়ের মতো পিয়ানো এবং অর্গান বাজাতে তিনি শেখেননি। বাবা শৈলেন্দ্র সিংহ সেতার বাজাতেন। তা-ও শেখা হয়ে ওঠেনি তাঁর। মায়ের উৎসাহে তিনি নাচ শেখেন। ষোলো বছর বয়স পর্যন্ত তিনি নাচ শিখেছিলেন। কবিতা সিংহ মনে করতেন, নাচ আর ছবি আঁকাই তাঁর জীবনে অর্পণ করেছে ছন্দ আর বর্ণ; দিয়েছে শরীরের স্ফূর্তি ও স্বাধীন বিকাশের আনন্দ। তাই কবিতার জীবনে অনেকখানি প্রভাব ছিল মায়ের।

কবিতা সিংহের জীবনে প্রভাব পড়েছিল মামার বাড়ি আর বাবার বাড়ির। যদিও এই দুই বাড়ির দুটি পরিবেশ ছিল সম্পূর্ণ বিপরীত। মামার বাড়িতে ছিল রক্ষণশীল মনোভাব; সেখানে গ্রাম্য বিশ্বাস-অবিশ্বাসের মিশ্রণে গড়ে উঠেছিল কবিতার মন। আবার পিতৃগৃহে ছিল আত্মসারশূন্য উন্নাসিক মনোভাব। সেখানে জীবন ছিল আধুনিক; তাদের বাইরের জীবনযাত্রায় ছিল পশ্চিমি আদব-কায়দা। কিন্তু ভেতরে-ভেতরে তাঁরা ছিলেন আত্মমগ্ন ও সংকীর্ণ। চোদ্দো বছরের পর ঐ পরিবারে কোনো মেয়েই কুমারী থাকেনি। কবিতা সিংহ এক্ষেত্রে ছিলেন ব্যতিক্রম। কমবয়সে তাঁর বিয়ের পথ রোধ করে দাঁড়িয়েছিলেন তাঁর মা। সেজন্যে তাঁর মায়ের মৃত্যুর পরেও, তাঁর পিতৃকুল ক্ষমা করেনি তাঁর মাকে। সিংহ পরিবারে ছেলেদের জন্যে ছিল সেন্ট জেভিয়ার্স স্কুল। আর অতি অনিচ্ছাসত্ত্বেও মেয়েদের জন্যে ছিল বেলতলা গার্লস। এই বেলতলা গার্লস স্কুলেই পড়তেন কবিতা সিংহ। ছেলে এবং মেয়ের মধ্যে এই অসমতার চিত্র দেখেই বড় হন কবিতা। তাই এই লৈঙ্গিক অসমতা তাঁর সাহিত্যের একটা বড় জায়গা অধিকার করে থাকে। তিনি এই অসাম্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদেও সোচ্চার হন। এই প্রতিবাদের বীজ বপন হয়ে গিয়েছিল অনেক ছোট বয়সেই। আর এ-বিষয়ে কবিতার ওপরে বিশেষভাবে ছিল তাঁর মায়ের প্রভাব; বাবার ওপর আবার কবিতার ছিল প্রবল অভিমান। বাবার বিপুল প্রতাপ, সংকীর্ণ মানসিকতাকে কবিতা কোনোদিনই মেনে নিতে পারেননি। মাত্র কুড়ি বছর বয়সে তিনি পিতা মাতার অমতে সহপাঠী, গল্পকার, নাট্যকার ও কবি বিমল রায় চৌধুরীর সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। 'অমৃতবাজার পত্রিকা'য় কলমচি হিসেবে তিনি কাজ শুরু করেন। কবিতা সিংহের ছদ্মনাম ছিল সুলতানা চৌধুরী। তিনি সামান্য কিছুদিন শিক্ষকতাও করেছিলেন। সংসারের প্রয়োজনে তিনি কিছুদিন টিউশনিও করেছেন। কবি কবিতা সিংহ স্বনামধন্য 'দেশ' পত্রিকা, 'প্রসাদ' পত্রিকা, 'শতভিষা' ও 'কৃত্তিবাস' পত্রিকার নিয়মিত লেখিকা হিসাবে সুনাম অর্জন করেছিলেন। ১৯৪৬ সালে

পনেরো বছর বয়সে 'নেশন' পত্রিকায় প্রথম কবিতা সিংহের কবিতা প্রকাশিত হয়। সেটি 'সম্ভবত একটি ইংরেজি কবিতা।' [কবিতা সিংহ, (সম্পাদকের প্রশ্নের উত্তর দেন কবিতা সিংহ), স্বনির্বাচিত। কাব্য জীবন : কবিতা সংকলন গ্রন্থ, ১৯৭০]

বেলতলা গার্লস থেকে স্কুলশিক্ষা শেষ করে কবিতা সিংহ ভর্তি হন প্রেসিডেন্সি কলেজে। কিন্তু বাড়ির অমতে বিয়ে করায় পড়াশোনায় ছেদ ঘটে। তাঁর স্বামী বিমল রায়চৌধুরী তখন পড়তেন স্কটিশ চার্চ কলেজে। দুজনেই বিএসসি পড়তেন। বিয়ে করার ফলে কবিতা সিংহের পড়া বন্ধ হলেও বিয়ের সাত বছর বাদে স্বামীর উদ্যোগে আবার পড়াশোনা শুরু করেন। বিমলবাবু নিজেও আবার পড়া শুরু করেন। পরে তাঁরা দুজনেই গ্র্যাজুয়েট হন। কবিতা সিংহ যোগমায়া দেবী কলেজ থেকে বোটানিতে অনার্স নিয়ে বিএসসি পাশ করেন। অত্যন্ত মেধাবী ছাত্রী কবিতা ডিস্টিংশন পেয়ে গ্র্যাজুয়েট হয়েছিলেন। কবিতা সিংহের স্বামী বিমল রায়চৌধুরী (১৯৩০-৭৬) ছিলেন রংপুরের জমিদার মনীন্দ্র রায়চৌধুরীর ছেলে। তিনি কবিশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ছদ্মনামে গল্প লিখতেন। তিনি ছিলেন গল্পকার এবং সম্পাদক। কবিতা সিংহের সাহিত্যরচনার পেছনে ছিল স্বামীর বিশেষ উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা। তাঁদের বিয়েতে বাড়ির মত না থাকায় দুজনকেই পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে কঠিন জীবন সংগ্রাম করে বেঁচে থাকতে হয়েছিল। কুড়ি থেকে উনত্রিশ বছর—এই সময়টা অত্যন্ত কষ্টে কেটেছে কবিতা সিংহের। অভিজাত পরিবার, প্রাচুর্যের পরিবেশ ছেড়ে কবিতা চলে আসেন দরিদ্রের সংসারে। এ-সময়ে জীবনের সঙ্গে অনবরত যুদ্ধ করে চলতে হয়েছে তাঁকে। অমৃতবাজার পত্রিকায় কলমচি হিসেবে কর্মজীবন শুরু হয় তাঁর। অমিতাভ চৌধুরী (নিরপেক্ষ) কবিতা সিংহকে আলাপ করিয়ে দেন 'অমৃতবাজার' পত্রিকার উইলিয়াম ওয়াকারের সঙ্গে। প্রায় চার বছর ওই পত্রিকার পাতায় ছদ্মনামে 'অ্যাজ আই সি ইট' নামে একটি কলাম লিখতেন কবিতা সিংহ এবং অন্যান্য বিষয়ে রিপোর্টিংও করতেন। এককথায় বিচিত্র কর্মমুখর জীবন ছিল কবিতার। কবিতা লড়তে-লড়তে এগিয়েছিলেন। সন্তান গর্ভে নিয়ে তাঁকে নাচের স্কুলে মাস্টারি করতে হয়েছে, বিজ্ঞাপনের কপি লিখতে হয়েছে, খবরের কাগজের জন্য ফ্রিল্যান্স রিপোর্টিং, সিনেমার শুটিং কভারেজ, চিত্রতারকার সাক্ষাৎকার নেওয়া, সরকারি অফিসে লোয়ার ডিভিশন ক্লার্কের চাকরি, মফস্‌সলের স্কুলে মাস্টারি, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অফিসের সাব-এডিটারি প্রভৃতি বিভিন্ন ধরনের পেশার মধ্যে দিয়ে কবিতা সিংহের এই সময়টা কেটেছে। সাংবাদিকতার জন্য তাঁকে যেতে হয়েছে গ্রামে, বস্তিতে, যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশে, গঙ্গাসাগরে, জাম্বো দ্বীপে, আবার বিলাস-ব্যসনে মত্ত সমাজের ওপরতলায়। ষাটের দশকে আকাশবাণীতে অস্থায়ী কর্মী হিসেবে যোগ দেন

কবিতা। তাঁর জীবনের এই বিচিত্র ধরনের অভিজ্ঞতা উঠে আসে তাঁর লেখার ভেতরে। তবে এই জীবনসংগ্রামের সময়টা কবিতার কাছে ছিল তাঁর 'জীবনের সেরা কাল'। কারণ এই সময়টা তাঁর কাছে নিজেকে যাচাই করার, অন্যকে যাচাই করার সময়। এই কালপর্বেই কবিতা সিংহ লিখেছেন অসংখ্য কবিতা। এ-সময়েই গল্প-উপন্যাস লিখতে শুরু করেছেন তিনি। ১৯৬৫-তে আকাশবাণী কলকাতা কেন্দ্রে 'বাংলা কথিকা' বিভাগের সহকারী প্রযোজিকা হিসেবে তিনি যোগ দেন। ষাটের দশকের মাঝামাঝি থেকে নববইয়ের দশকের গোড়ার দিক পর্যন্ত তিনি বিশেষভাবে যুক্ত ছিলেন আকাশবাণীর সঙ্গে। আকাশবাণী কলকাতা কেন্দ্রের প্রথম মহিলা অধিকর্তা হন কবিতা। রেডিও সূত্রেই প্রথমবার বিদেশ যাত্রা করেন তিনি। বেতারে উচ্চতর কুশলতার জন্য ১৯৭৯ খ্রিষ্টাব্দে তিনি পূর্ব জার্মানিতে গিয়েছিলেন। ১৯৮১-তে আমেরিকার আইওয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের লেখক ওয়ার্কশপের আন্তর্জাতিক সম্মেলনে নির্বাচিত হয়েছিলেন তিনি। পশ্চিম জার্মানির 'ফ্রাঙ্কফুর্ট বুক ফেয়ারে' ভারত উৎসবের সময় আমন্ত্রিত হয়েছিলেন কবিতা সিংহ। পরে বহুবার আমেরিকায় যান কবিতা। তাঁর ছোট মেয়ে পরমেশ্বরী আমেরিকার বোস্টনে থাকেন। ছোট মেয়ের কাছে বোস্টনেই ১৯৯৮-এর ১৭ অক্টোবর মৃত্যু হয় কবিতা সিংহের। তিনি ছিলেন তিন সন্তানের জননী। দুই মেয়ে রাজেশ্বরী ও পরমেশ্বরী এবং ছেলের নাম কনাদ রায়চৌধুরী।

নারী মুক্তি আন্দোলনের পথিকৃতের মধ্যে অন্যতম হিসাবে পাঠক মহলের সমাদৃত হয়েছেন কবিতা সিংহ। নারীর আত্মমর্যাদার লড়াই তাঁকে বিশিষ্ট করেছে। কবিতা সিংহ মূলত কৃতীছাত্রী ও সুসাহিত্যিক। বিশ শতকের পাঁচের দশকের কবিতা আন্দোলনের সঙ্গে তিনি ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিলেন। নারীবাদী দৃষ্টিভঙ্গির জন্য কবির বন্ধুবর্গরা কবিকে "ভার্জিনিয়া উলফ" বলে ডাকতেন। কবিতা সিংহের উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থগুলি হল— 'সহজ সুন্দরী', 'কবিতা পরমেশ্বরী', 'হরিণাবৈরী', 'শ্রেষ্ঠ কবিতা', 'সোনারূপার কাঠি', 'মোমের তাজমহল' প্রভৃতি। এছাড়া সম্পাদনা করেছেন 'ইদানিং', 'সপ্তদশ অশ্বারোহী' ও 'সত্তরের কবিতা সংকলন'। নারী হয়ে নারীদের জীবনের ব্যথা বেদনা ও অন্যায় শোষণ নিয়ে কবিতা সিংহের মনে অনেক দুঃখ ও যন্ত্রণা ছিল। তাঁর বহু কবিতার মধ্যে তার মনের ঋজু চিন্তা ও প্রতিবাদী মনোভাব প্রকাশিত হয়েছে। পাঁচের দশক থেকে লেখালেখি শুরু করলেও মূলত তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে আর একটু পরে ষাটের দশকে 'সহজসুন্দরী', ১৯৬৫ খ্রিস্টাব্দে। কবিতা সিংহ সাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রতি সুমহান অবদানের জন্য নানা পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন যেমন— 'লীলা পুরস্কার', 'মতিলাল পুরস্কার' ও 'ভূয়ালকা' পুরস্কার।

'আনন্দবাজার' পত্রিকায় ষোলো বছর বয়সে কবিতা সিংহ লেখেন 'আর্ট ও নারী'। এখানে বিজ্ঞাপনে নারীশরীরের ব্যবহার নিয়ে তিনি লিখেছিলেন। এর বেশ কয়েক বছর পরে তেইশ থেকে পঁচিশ বছর বয়স পর্যন্ত এক বিখ্যাত ইংরেজি চলচ্চিত্র সাপ্তাহিক সিনে অ্যাডভান্সের মেয়েদের পাতা সম্পাদনা করতেন তিনি। তখন তিনি উঠতি চিত্রতারকাদের গ্লামারাস ফটোগ্রাফসমেত প্রতি সপ্তাহে একটি করে চটকদার রচনা লিখতেন। তাঁর 'পাপপুণ্য পেরিয়ে' (১৯৬৪) উপন্যাসের চরিত্র বাসনা বলে, "মেয়েদের পুরুষরা নিজেদের ব্যবসায়ে কিভাবে ব্যবহার করে এ নিয়ে ধোঁয়া উঠছে এমন প্রবন্ধ লিখেছিলাম ষোল বছর বয়সে। এখন আমি হচ্ছি মেয়েদের এক্সপ্লয়েট করার ষড়যন্ত্রের অন্যতম অংশীদার। আমি নিজের মাংস নিজের কাঁধে বয়ে নিয়ে যাচ্ছি।" এখানে কবিতা সিংহের ব্যক্তিগত জীবন ও লেখনী সত্তা কোথাও যেন মিলেমিশে একাকার হয়ে যায়। কবিতা সিংহের 'বৃক্ষ' কবিতায় নারীর বৃক্ষ হয়ে ওঠার প্রত্যয় রয়েছে। বৃক্ষ মানুষের জীবনে পরম ভরসা, অটল বিশ্বাস বা প্রত্যয়ের প্রতীক এবং তার কাছ থেকেই মানুষ আন্তরিক ও বাহ্যিক রূপের সমন্বয়ে প্রকৃত ও প্রাণবন্তভাবে বেঁচে থাকার পাঠ গ্রহণ করে। কবিতা বলেছেন—

"বার বার বৃক্ষই কেবল
বৃক্ষই আমার কাছে ফিরে ফিরে আসে
প্রত্যয়ের মতো
এমন প্রত্যয় আর বৃক্ষশাখা ভিন্ন কোথা রাখি
বৃক্ষই আমার সব
আর সাবেকী
বৃক্ষ থেকে শিখে নিই বাহিরে ভিতরে
এইসব মনোময় অঙ্গময় প্রাণময় বাঁচা"

আলোচ্য কবিতায় বৃক্ষকে 'সাবেকী' বলা হয়েছে কারণ সে সুপ্রাচীন কাল থেকে পৃথিবীর বুকে জীবনধারণের আদিমতম প্রতীক। মানুষের সভ্যতার বিকাশ ও টিকে থাকার মূল ভিত্তি হল এই প্রকৃতি ও বৃক্ষ, তাই কবি একে তাঁর 'সব' বা জীবনের সর্বস্ব বলে মনে করেন। লেখিকার ইকোফেমিনিস্ট দৃষ্টিভঙ্গি এই কবিতাকে বিশিষ্ট করেছে। সাবেকি রীতির কবিতাও লেখেন কবিতা সিংহ, তাই তাঁর কবিতায় প্রেম ও প্রকৃতি মিলেমিশে একাকার হয়ে যায়। যেমন—

"একটি যূথীমালা তোমার এলোচুল
ছড়িয়ে দিতে চায় আমার ভীরুমন

সে সাধ ফুটে আছে ভোরের ঘাসফুলে।
সে মালা নিলে তুমি অবাধ চোখ তুলে
মালার তো নয় ও যে, আমার যৌবন
একটি যূথীমালা তোমার এলোচুলে"!

আবার আরো একটি কবিতায় কবিতা সিংহ আশা ভোঁসলের ১৯৬৫ সালের 'মেরা সায়া' সিনেমার একটি জনপ্রিয় গানের প্রসঙ্গ উত্থাপন করে মানুষের জীবনে বাহ্যিক ঠাটবাট ও সস্তা জনপ্রিয়তার পেছনে অন্ধের মতো ছোটা এবং শেষমেশ নিজের আসল সত্তাকেই হারিয়ে ফেলাকে ব্যঙ্গ করেছেন—

"এই যদি তোর মনে ছিল
কেন মাইরি রং দ্যাখালি
বেরিলির ওই বুড়ো বাজারে
ঝুমকো জোড়া হারিয়ে এলি।
পাবই সিওর জেনে গিয়ে
ঝুঁঝকো বেলা রওনা হলি
দূরে হলেই বড় দোকান।
চাঁদনিচকে পথ হারালি"।

তাঁর কবিতায় 'রং দেখানো' বা 'বরেলির বাজারে ঝুমকো জোড়া হারিয়ে ফেলা' আসলে মানুষের জীবনের মোহাচ্ছন্নতা ও অমূলক স্বপ্ন দেখার প্রতীক। মানুষ যখন বাহ্যিক চাকচিক্য বা সাময়িক আবেগে গা ভাসিয়ে বড় কোনো স্বপ্ন দেখে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা ধরে রাখতে পারে না, তখনই ঘটে এই ট্র্যাজেডি। কবি বোঝাতে চেয়েছেন, মনের গভীরে যদি সততা বা স্থায়ী কোনো উদ্দেশ্য না থাকে, তবে বাইরের জৌলুস বা 'রং' দেখানো একসময় ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। 'ঝুমকো' হল অর্জিত সম্মান, সৌন্দর্য বা অহংকারের প্রতীক। বরেলির মতো এক ব্যস্ত, অচেনা 'বুড়ো বাজারে' (যা আসলে এই জটিল পৃথিবীরই রূপক) মানুষ তার জীবনের সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ বা আত্মসম্মানও অসাবধানতাবশত হারিয়ে ফেলে নিঃস্ব হয়ে যায়।

কবি কবিতা সিংহ কন্যা 'পরমেশ্বরীকে' কবিতার উত্তরাধিকার কীভাবে দিয়ে যাবেন তার চালচিত্র নকশীকাঁথার মতো অঙ্কন করেছেন—

"আমার নিকটে যত চাবি আছে সব ফেলে দেব
এখন তোমার জ্বালা আগুনে হাপরে
লৌহের মাপের গণিতে

চাবি করা, পরখ পরখ ফের, ফেলে দেওয়া
আবার বানানো!
এভাবেই তোমাকে আমার
সব উত্তরাধিকার দিয়ে যেতে হবে"!

আমাদের পণ্যায়িত সমাজ সংস্কৃতির বিনোদনকে কবিতা সিংহ ব্যঙ্গ করেছেন। বর্তমান সময় ও সমাজে প্রেম, প্রীতি ও ভালোবাসা সামান্য বোঝাপড়া মাত্র। মানুষের মন যে কোনো সময় ভেঙে চৌচির হয়ে যাচ্ছে। ভালোবাসার অনুভূতি আর হৃদয়কে নাড়া দেয় না, হৃদয়ের মধ্যে কোন অনুতাপ ও অনুশোচনা আজকের দিনে আর জাগে না। এভাবেই লেখিকা উত্তর আধুনিক আবেগহীনতায় প্রেম, প্রকৃতি ও ভালোবাসাকে ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ করেছেন। কবিতা বলেছেন—

"ভালোবাসা চাই ভালোবাসা
হাঁকছে পথে ফেরিওয়ালা।
বেরিয়ে দেখি ভুল শুনেছি
বোল হরিবোল বোল হরিবোল" (লাল তামাশা —কবিতা সিংহ)

কবি কবিতা সিংহ জীবনের উপান্তে পৌঁছেও অফুরন্ত প্রাণশক্তিতে ভরপুর ছিলেন। জীবনের পরিণতি নিয়েও কবিতা রচনা করতে ছাড়েননি। কবিতা সিংহ 'প্রসাদ' পত্রিকার পাতায় পঞ্চাশের দশকের সময় ও সমাজকে পাথেয় করে বিষয়বস্তু পরিবেশনের ক্ষেত্রে স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় রেখেছিলেন। একাকিত্ব ও অন্ধকার —এই দুই খুবই প্রিয় ছিল কবিতা সিংহের। যে চেতনাদীপ্ত, বোধদীপ্ত অনুভূতির তিনি অধিকারিণী ছিলেন, তা শুধু একাকিত্বকেই বরণ করে নেয়। তাঁর সমস্ত কবিতার শরীরে বয়ে চলেছে সচেতন নারীর একাকিত্ব; তবে তা কখনোই তাঁর মনকে দুর্বল করেনি। বরঞ্চ ঘুরে দাঁড়ানোর সাহস জুগিয়েছে। যে একাকিত্ব ছিল কবিতার বেঁচে থাকার রসদ হয়েছে। অন্তঃপুরের চার দেওয়াল, সাহিত্য চর্চায় সামাজিক অস্বীকৃতি, শিক্ষিত নারীর নিজস্ব ব্যথা ও দ্রোহ তাঁকে অন্যদের থেকে পৃথক ও একাকী করে তুলেছে। তাঁর 'শেষপর্বে মাখামাখি হয়' কবিতা পাঠককুলকে নাড়া দিয়ে যান। কবিতা লিখেছেন—

"এইভাবে এ আঁধার নিয়তি তোমার নারী
চুম্বকের তীব্র টানে ক্রমশ তোমাকে নেয় নিজ ও কেন্দ্রমুখে
কোনো ফুলকি নিমেষ আশার
ভাঙে না আঁধারশায়ী কৃষ্ণ- একাগ্রতা
মৃত্যুটানে বায়ুক্রমে সুস্থির নিষ্কম্প্র হয়ে আসে"!

তাঁর চিন্তা-ভাবনা, সাহিত্য রচনা— সবকিছুই সমসাময়িক কাল থেকে অনেকখানি এগিয়ে ছিল। এক অদ্ভুত আত্মপ্রত্যয় ছিল তাঁর স্বরে। পিতৃতান্ত্রিক সমাজের একপার্শ্বিক ভাবনাকে ভাঙতে চেয়েছিলেন তিনি। তিনি কল্পনা করেছিলেন এক নতুন ভবিষ্যতের; যেখানে থাকবে না শ্রেণি, বর্ণ, লিঙ্গ নির্বিশেষে কোনো শোষণ। বাংলা সাহিত্য-সমালোচনার জগতে খুব বেশি আলোচনা হয়নি কবিতা সিংহের কবিতা। এ নিয়ে তাঁর নিজেরও অনেক আক্ষেপ ছিল। তিনি 'মহিলা কবি' হিসেবে স্বীকৃতি পেতে চেয়েছিলেন। নবনীতা দেবসেন বলেছিলেন— "তিনি যখন লিখতে শুরু করছেন তখন আধুনিক কবিতা লিখতেন চারজন মহিলা যথা— রাজলক্ষ্মী দেবী, হেমা হালদার, শিপ্রা ঘোষ ও কবিতা সিংহ। নবনীতা কবিতার মধ্যে দেখেছিলেন নারীর 'আত্মানুসন্ধানের যন্ত্রণাময় পথ-পরিক্রমা'।" বাংলা কবিতা তাঁর হাত ধরেই প্রথম নারীবাদের ছোঁয়া পেয়েছিল। ফলে তাঁর সমসাময়িক কালে এবং পরবর্তীকালে মেয়েরা তাঁদের সাহিত্যরচনায় সমাজে মেয়েদের বঞ্চনা, অসহায়তার প্রসঙ্গকে সাহসিকতার সঙ্গে প্রকাশ করতে পেরেছিলেন। তাঁর সাহসিকতার প্রসঙ্গে নবনীতা দেব সেন আরো বলেছেন— "কফি হাউসের দরজায় দীপশিখার মত উজ্জ্বল এবং সহজ সুন্দরী কবিতা সিংহকে সেই প্রথম দেখা মুহূর্ত থেকেই যে বিশেষ শ্রদ্ধার চোখে দেখেছিলুম সে চোখ কখনো বদলায়নি। অবাক হয়ে শুনেছিলুম, বিমল রায়চৌধুরীর স্ত্রীর নাম কবিতা সিংহ। সেই পঞ্চাশের দশকে এমনটি হত না। কিন্তু কবিতা সিংহ যে সকল দিক থেকেই একমেবাদ্বিতীয়ম্, বাংলা সাহিত্যে তাঁর কোনো তুলনা নেই। আজকের নারীবাদিনীদের চেয়ে অনেক ক্রোশ বেশি পথ হাঁটতে হয়েছিল তাঁকে। আর এগিয়ে ছিলেন যোজন-যোজন বেশি। জীবন তাঁর সরল ছিল না। না ঘরে, না কর্মক্ষেত্র। হবে কী করে, কবিতাদি যে রণরঙ্গিনী!

রণক্ষেত্রে দেখা হবে সম্মুখ সমরে তীব্র
ইস্পাতের অচিত্র-অঙ্গদে। অমনি তো শিখিনি
মাতা রমণীয় পশ্চাৎপসরণ।

এই অচিত্র-অঙ্গদ নারীর কবিতায় নগ্ন তরবারির মত নারীবাদ যখন ফুঁসে উঠেছে, বর্তমান পশ্চিমি দুনিয়ার আধুনিক নারীবাদ তখনও তেমন করে জেগে ওঠেনি।"

('শমীবৃক্ষে রমণী হে একা?', দশম বর্ষ, জানু ১৯৯৯)

লেখিকা কবিতার পাশাপাশি সাহিত্যের অন্যান্য প্রকরণ গল্প-উপন্যাসেও সমানভাবে পদচারণা করেছেন। তবে বাংলা সাহিত্যের জগতে মূলত কবি হিসেবেই তিনি প্রতিষ্ঠিত হয়ে আছেন। পঞ্চাশ-ষাট-সত্তরের দশকে কবিতা লিখলেও বর্তমান সময়ে দাঁড়িয়েও তাঁর কবিতা অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। তাঁর কবিতার বিষয়বস্তু, ভাষা, প্রকাশভঙ্গি একেবারেই

স্বতন্ত্র। পূর্বেই বলেছি ছয়ের দশকে প্রথম কবিতার বই প্রকাশিত হলেও, পাঁচের দশক থেকেই কবিতা লেখার সূচনা। বাংলার ছোটো-বড় বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় অজস্র কবিতা লিখেছেন তিনি। কবিতার বইয়ের সংখ্যা তিনটি। (১) 'সহজসুন্দরী' (১৯৬৫), (২) 'কবিতা পরমেশ্বরী' (১৯৭৬), (৩) 'হরিপা বৈরী' (১৯৮৩)। তিনটি কাব্যগ্রন্থের প্রত্যেকটির মধ্যেই প্রায় এক দশকের ব্যবধান। ১৯৮৭ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয় কবিতা সিংহের শ্রেষ্ঠ কবিতা। তিনটি কাব্যগ্রন্থ থেকে কবি তাঁর প্রিয়তম কবিতাগুলিকে চয়ন করেছেন শ্রেষ্ঠ কবিতায়। তার সঙ্গে যুক্ত করেছেন তখনও প্রকাশিত না-হওয়া কাব্যগ্রন্থ 'বিমল হাওয়ার হাত ধরের' কতকগুলি কবিতা এবং রবীন্দ্রনাথকে নিবেদিত শত কবিতা —রবীন্দ্রনাথের নামের কয়েকটি কবিতা।

'বিমল হাওয়ার হাত ধরে' কাব্যগ্রন্থে 'আছেন ঈশ্বরী' কবিতায় কবিতা সিংহ দেখিয়েছেন কাব্যের কোনো ঈশ্বর নেই, আছেন ঈশ্বরী। কবিতাই পরম ঈশ্বর; এখানে কোনো নিরাকার বা অলৌকিক ঈশ্বরের কথা বলা হয়নি। কবির কাছে লেখার শক্তি বা সৃষ্টিই সব। কবিতা সিংহ আবার নারী এবং কবিতাকে একসাথে মিলিয়ে দেখেন। নারীর গর্ভধারণ এবং কবিতার জন্ম হওয়া কোথাও যেন মিলেমিশে একাকার হয়ে যায় কবির কাছে। এই ঈশ্বরী বা কবিতার রূপ এখানে কঠোর ও নির্মম; তিনি সমাজ ও মানুষের জীবনে বঞ্চনা, অপমান ও নির্বাসন নিয়ে আসেন। চরম বেদনা ও ভাঙনের মধ্য দিয়েই কবি এই 'আরাধ্য অক্ষর' বা সত্যকে খুঁজে পান, যা একাধারে ধ্বংসকারী ও নতুন জীবনের সৃষ্টিকর্তা। এভাবেই বিপদের মুখেও 'সেনাই থেকে নেমে এসে একলা মোজেস'-এর মতো সত্যদ্রষ্টারা পৃথিবীতে নতুন দিশা ও নৈতিকতার আলো নিয়ে ফিরে আসেন। তাঁর কাছে কবিরা মোজেসের মতো একা। আর সেইসব বুদ্ধিমতী নারী, যাঁরা নিজেদের অধিকার বুঝে নিতে চান, নিজেদের সৃষ্টির মধ্যে দিয়ে সেই গভীর কথাকে বলতে পারেন সহজভাবে – তাঁরা আরও অনেক বেশি একা, নিঃসঙ্গ।

কবিতা সিংহের কবিতায় ফুটে ওঠে সমাজের নানাধরনের পীড়নের ও প্রতিবাদের চিত্র। যেমন— দলিত শ্রেণির প্রতি অবিচারের বিরুদ্ধ স্বর ও শ্রেণিবৈষম্যের বিরুদ্ধ স্বর। এছাড়াও রয়েছে সমাজের নারী-পুরুষের লৈঙ্গিক বৈষম্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ। এরসঙ্গে তিনি দেখান দলিত সমাজের মেয়েদের কীভাবে পুরুষের থেকে দ্বিগুণ বেশি যন্ত্রণা সহ্য করতে হয়। শ্রেণি এবং লিঙ্গের উভয় পরিচয়ই তাদের রক্তমজ্জায় সঞ্চারিত করে দেয় অশৌচ। এভাবেই তাঁরা জীবনের স্বাভাবিক অধিকার থেকে বঞ্চিত হন। তথাকথিত উচ্চবর্ণের মানুষের দ্বারা তাদের চাওয়া-পাওয়া —সবকিছুই নিয়ন্ত্রিত হয়। তারা বুঝতে পারে— 'নিজের আজন্ম পাপ জন্ম অস্পৃশ্যতা।' ('ভাঙ্গী রমণীর ক্রোধে',

বিমল হাওয়ার হাত ধরে) এই কবিতায় অসহায় দলিত মানুষের ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে চলে উচ্চবর্ণের মানুষেরা। সমাজে প্রকাশ্যে তাদের ছোঁয়া নিষেধ; কিন্তু রাতের অন্ধকারে ব্রাহ্মণ পুরুষ স্পর্শ করে 'ভাঙ্গী রমণী'র গোপনতম অঙ্গকে। এই ঘটনা আমাদের মনে করিয়ে দেয় উদুপি চক্রবর্তী রাজা গোপালচারীর 'সংস্কার' উপন্যাসের কথা। যেখানে দিনের বেলায় অচ্ছুত ছুঁতমার্গ আর রাতের আঁধারে গোপনে উচ্চবর্গরা ম্লেছ সংসর্গ করেন।

কবিতা সিংহের লেখনী গর্জে উঠেছে নির্মম, পাশবিক কন্যাভ্রূণ হত্যার বিরুদ্ধেও। ভারতে কন্যা ভ্রূণ হত্যা রোধে প্রধান আইন হল PCPNDT Act (গর্ভধারণ পূর্ব ও প্রসব পূর্ব নির্ণয় প্রযুক্তি আইন), যা ১৯৯৪ সালে পাস হয় এবং ২০০৩ সালে সংশোধিত হয়। এই আইনের মূল লক্ষ্য হল ভ্রূণের লিঙ্গ নির্ধারণ নিষিদ্ধ করা এবং কন্যা ভ্রূণ হত্যা প্রতিরোধ করা। তবুও সমাজে এটি ব্যাধির মতো লোকজনের মানসিকতায় বাসা বাঁধে। কবির কণ্ঠে এই অনাচার সম্বন্ধে তাচ্ছিল্য আর ব্যঙ্গ ছাড়া কিছুই থাকে না—

'আমরা ভ্রূণ না ভ্রূণা
জন্ম দিও না মা!
মা আমার জেনে শুনে কখনো উদরে
ধরো না এ বৃথা মাংস
অযাচিত কখনো ধরো না।' ('ভ্রূণা', কাব্যনাটক)

কন্যাসন্তানের এই 'বৃথা জন্ম' তথা সমাজে অনাবশ্যকতাকে মেনে নিতে পারেন না কবিতা সিংহ। তাই সমাজ সংবেদনশীল কবি এই সামাজিক বঞ্চনার বিরুদ্ধে কবিতাকে প্রতিবাদের অস্ত্র করে তোলেন। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দেখা যায় পিতৃতান্ত্রিক সমাজে মেয়েরা পণ্য ছাড়া আর কিছুই নয়। পুরুষ এখানে মেয়েদের দেখে কামনার দৃষ্টিতে, ভোগের সামগ্রী হিসেবে। মেয়েরা শুধুমাত্র কতকগুলো অঙ্গের সমষ্টি মাত্র। তাদেরও যে কামনা-বাসনা থাকতে পারে, সে বিষয়ে কেউ ভাবে না। মেয়েদের নিজের ইচ্ছা জানানোর অধিকার নেই, অধিকার নেই নিজের চাহিদা প্রকাশ করারও। বলতে গেলে চিরকালই মেয়েরা পুরুষের কাছে 'সেক্স অবজেক্ট'। মেয়েদের রমণী, যোষিৎ নামের মধ্যেই তার আভাস রয়েছে। পাঁচের দশকে দাঁড়িয়ে যৌনতা নিয়ে খোলাখুলিভাবে কথা বলতে পারার সাহস দেখিয়েছিলেন কবিতা। আসলে কবিতা ছিলেন 'কৃত্তিবাস' গোষ্ঠীর কবি। এই গোষ্ঠীর কাছে কবিদের কবিতায় যৌনতা স্বাভাবিক ছিল। পরবর্তীকালে হাংরি জেনারেশনের কবিতায় এর ব্যাপক রূপ চোখে পড়ে। কবিতা সিংহ 'হরিণাবৈরী' কবিতায় বলেছেন—

অঘোর গৈরী পথ বৈরাগিনী
পথ না আগুন নদী ক্রুর-গামিনী
পোড়ে চুল জ্বলে ত্বক
নাঙা পদ ধক্ ধক্
জানে না সে ঘোরে ক্রোধ লোভী কামিনী
শাঁখিনী হাকিনী ধায় খরডাকিনী
কোথা রে হরিণ তুই চিন্তামণি?
বৈরী আপনা মাসে তোর হরিণী!

ভুসুকুর 'কাহেরে ঘিনি এলি আচ্ছহু কীস' পদটিতে আমরা দেখতে পাই শিকারী চারিদিকে বেড়া দিয়েছে। ব্যাধের তীরের নাগালের বাইরে পালিয়ে যাবার জন্য হরিণী হরিণকে বন ত্যাগ করে অন্যবনে পালিয়ে যাবার পথ নির্দেশ দিয়েছে। আমরা দেখেছি ক্ষিপ্র গতিতে হরিণের ছুটে চলার চিত্র। কিন্তু কবিতা সিংহ যে সময় কবিতা লেখেন তখন সময় বদলেছে, সমাজ বদলেছে, বদলেছে ব্যক্তি মানুষের রুচি, মানসিকতা, কিন্তু কোথাও না কোথাও রক্তের মধ্যে সেঁধিয়ে আছে আদিম রিপু। ভুসুকুর হরিণ কবিতা সিংহের কবিতায় হয়েছে হরিণী। সেই হরিণী সন্ত্রস্ত নারী। হরিণের মাংস যেমন তার নিজের প্রধান শত্রু, তেমনি নারীর দেহসুষমা তার প্রধান শত্রু। ফলে সমাজপথ তার কাছে নিরাপদ নয়। চারিদিকে লোলুপ দৃষ্টিতে ফাঁদ পেতে আছে আদিম রিপু। দেহকেন্দ্রিক নারীমাংসের লোভে কামনা বাসনায় লিপ্ত পুরুষ সমস্ত শুভবোধের জলাঞ্জলি দেয়। 'নারীর রূপকে তিনি নারীর মননশীল অস্তিত্বের শত্রু বলে মনে করতেন। অত্যন্ত রূপবতী ছিলেন বলেই হয়তো তাঁর মনে হত, নারীর রূপ তাঁকে যে দরজার দিকে টেনে নিয়ে যায়— তা তাঁর চেতনাদীপ্ত অস্তিত্বের বিরোধী। তিনি সব চাইতে বেশি মূল্য দিতেন চেতনাকে, মননশীলতাকে।' (তথ্যসূত্র : ভাস্বতী রায়চৌধুরী) উপরোক্ত কবিতায় হরিণের মতো নারীর আপন মাংসই তার বৈরী। তার চলার পথ আর কোনো পথ থাকে না। তা হয়ে ওঠে 'আগুন নদী', সে পথ 'অঘোর গৈরী'। সে পুড়ে যায়, ত্বক জ্বলে যায়। জীবনের যে বীণা বিচিত্র সুরে অনুরণিত হওয়ার কথা ছিল, তা হয়ে যায় একতারা। জীবনের শখ, স্বাদ, আহ্লাদ বিসর্জন দিয়ে নারী হয়ে ওঠে বৈরাগিনী।

"ভুসুকুর পদে হরিণকে পথ বলে দিয়েছিল তার হরিণী। আজ একাকী নারীকে পথ বলে দেওয়ার কেউ নেই। এ লড়াই তার একার। তাকেই খুঁজে নিতে হবে তার 'নিলয়'। একলা নিলয় খুঁজে চলা কোনো মেয়ে কোনো কালে, কোনো দেশে পেয়েছে কি নিজস্ব নিলয়? কোনো মেয়ের কোনো নিজস্ব ঘর আছে বা থাকে কিনা তা আমাদের জানা

নেই। তাই নিরাশ্রয় মেয়েদের অধিকারহীনতার মর্মদাহের কথা, মেয়েদের দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়া আত্মকথার পাতায় উচ্চারিত হয় তাদের অসহায় অধীনতার বিবরণ।" ধ্রুবকুমার মুখোপাধ্যায় (বাংলা কবিতা, পর্বে পর্বান্তরে)

যে সমাজ নারীর অধিকারকে মেনে নেয় না, যে সমাজ নারীর সম্মানকে গুরুত্ব দেয় না, যে সমাজ একাকী নারীকে ভোগের সামগ্রী করে রাখে, সেই সমাজের প্রতি তীব্র বিদ্বেষ নিয়ে নারী হয়ে ওঠে প্রতিবাদিনী। যে সমাজ নারীমনের খোঁজ রাখে না, সেই সমাজের প্রতি বর্ষিত হয় অবরুদ্ধ নারীর অগ্নিবাণ। সমস্ত কমনীয়তা, পেলবতাকে বিসর্জন দিয়ে সে অস্তিত্ব রক্ষার তাগিদে হয়ে ওঠে শ্মশানবাসিনী রুদ্রাণী। পুরুষরা সমাজে অনুশাসন তৈরি করেছে নিজের সুবিধার্থে। হয়ে উঠেছে আধিপত্যবাদী। সমাজে নারীর এই অবস্থানই প্রতিবাদের ভাষা তৈরি করেছে কবিতা সিংহের। তিনি বিশ্বাস করেন— পুরুষ-নারীর সম্পর্ক সমান দোসরের, সহযোদ্ধার মতো। অনেকে আতিশয্যবশে একথা ভুলে যান। র‍্যাডিক্যাল ফেমিনিস্টরা মনে করেন, পুরুষ-বিদ্বেষই নারীর আত্মপ্রতিষ্ঠার পথ। কিন্তু তাদের সেই বেশি প্রতিবাদ কখনো কখনো দুর্বলতাকে চিহ্নিত করে। কবিতা সিংহের মধ্যে সে-দুর্বলতা নেই। তিনি তাঁর নারীসত্তাকে প্রকাশ করেননি— এমন ভাবা উচিত নয়। তাঁর সময়ে নারীর পরিসর ছিল সংকীর্ণ। তিনি সেই সংকীর্ণতার কথা বলেন বীরের মতো করে। সেখানে তাঁর মধ্যে কোনো বিনয় নেই। তিনিই প্রথম কবি, যাঁর কবিতায় শোনা যায় পুরুষতন্ত্রের বিরুদ্ধে এক সুদৃঢ় বিদ্রোহ। মেয়েজন্ম নিয়ে তিনি উচ্চকণ্ঠে সোচ্চারিত হন—

> 'মা, হাতের উল্টো পিঠে মুছে নিয়েছি শেষবারের মত
> দু' চোখ ছাপিয়ে নামা চোখের জলের বৃথা দাগ
> বেণীর সার্টিন খুলে উর্ধ্বশ্বাসে ছুটে গেছি আমি
> অশ্বক্ষুরে ঝনঝন্ নারীদের দর্পণ ফাটায়ে
> খরকরবালে একা পিতার রক্ষিতার মুণ্ড এনে দিতে।
> তাই ঘৃণা, দুই চোখ কাজল জানেনি
> নারীর শৃঙ্গার ছলা দর্পণের পায়ে পায়ে ক্লিন্ন অধীনতা
> কার জন্য এত সাজ? বক্ষ বাঁধা? নীবি?
> সমস্ত পুরুষ সেই আদি পিতা, নিষ্ঠুর অশুচি
> তোমার স্তনের থেকে ছিন্ন করে ভুবন ঘোরাবে।'

('আজীবন পাথর-প্রতিমা', কবিতা পরমেশ্বরী)

এখানে কবিতা সিংহ নারীর সাজগোজের মাধ্যমে সামাজিক বিধিনিষেধ ও পুরুষের

মন জুগিয়ে চলার প্রথাকে তীব্র প্রশ্নবিদ্ধ করেছেন। পুরুষশাসিত সমাজের নিষ্ঠুরতাকে তিনি 'অশুচি' বলে চিহ্নিত করেছেন। সমাজের একপার্শ্বিকতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও প্রত্যাখ্যান কবিতা সিংহের কবিতার একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। তিনি কেবলমাত্র নারীসত্তার প্রতিষ্ঠার কথা বলেননি, বলেছেন পরিপূর্ণভাবে এক ব্যক্তিসত্তার প্রতিষ্ঠার কথা। তিনি বলেন—

'না, আমি হবো না মোম
আমাকে জ্বালিয়ে ঘরে তুমি লিখবে না।
হবো না শিমূল শস্য সোনালী নরম
বালিশের কবোষ্ণ গরম।
কবিতা লেখার পরে বুকে শুয়ে ঘুমোতে দেব না।
আমার কবন্ধ দেহ ভোগ করে তুমি তৃপ্ত মুখ;
জানলে না কাটামুণ্ডে ঘোরে এক বাসন্তী-অসুখ
লোনা জল ঝাপসা করে চুপিসারে চোখের ঝিনুক!'

('না', সহজসুন্দরী)

মেয়েদেরকে মোমের মতো নরম, পেলবরূপে দেখা পুরুষতান্ত্রিক সমাজের বৈশিষ্ট্য। কবিতার প্রথমেই এই মিথকে ভেঙেছেন কবিতা সিংহ। পুরুষের নির্মিত আশ্রয়দাত্রী, রহস্যময়ী, পেলব নারীমূর্তিকে ভেঙে দিতে চেয়েছেন তিনি। বের করে আনতে চেয়েছেন প্রকৃত নারীসত্তাকে। তাঁর প্রতিবাদ দৃপ্ত ও ক্রুদ্ধ। মেয়েরা সবসময় পুরুষের রচনার প্রেরণাদাত্রী হয়ে থাকতে চায় না। ব্যবহৃত হতে দিতে চায় না নিজেকে। তাই অনেক সময় পুরুষের সঙ্গে মিলনের মুহূর্তেও একা হয়ে যায় তারা। এভাবেই আমাদের সমাজে বহু মেয়ের প্রেমহীন অসহায় যান্ত্রিক জীবন কেটে যায়।

কবিতা সিংহ তাঁর কবিতায় দেখান— পুরুষতান্ত্রিক সমাজ অনেক সময়ই নারীকে কেবল একটি শরীর বা ভোগের মাধ্যম হিসেবে বিবেচনা করে। কবি এখানে শরীরকে 'কবন্ধ দেহ' (মাথাহীন শরীর) বলে উল্লেখ করেছেন। কারণ পুরুষ উপভোক্তার কাছে নারীর মন বা মস্তিষ্কের চিন্তাভাবনার কোনো মূল্য থাকে না। শরীরী মিলনে পুরুষ সঙ্গী তৃপ্ত হলেও, সে জানতেও পারে না নারীর 'কাটামুণ্ডে' (তার নিজস্ব সত্তা ও মস্তিষ্কে) কী তীব্র মানসিক যন্ত্রণা, অশান্তি বা আকুলতা ঘুরে বেড়ায়। এই মানসিক ছটফটানি ও না-বলা বেদনাকেই কবি 'বাসন্তী-অসুখ' বলেছেন।

'কি নেবে দেহের থেকে? মাংস মেদ বসা?
প্রাগৈতিহাসিক অগ্নি? পোড়া মাংসের ঘ্রাণ, রক্ত-পানীয়

নখ দাঁত চুল কিংবা অন্নপাত্র দিব্য করোটি?
অথবা কি নিষ্কাশন করে নেবে প্রতিভা ও মেশিনের মিশ্র কুশলতা?
অথবা জাদুর টুপি যেভাবে ওড়ায় লক্ষ কুন্দ পায়রা
সেভাবে দেহের থেকে চাড় দিয়ে ক্রমাগত খুলে নেবে শিশু।'

('দেহ', কবিতা পরমেশ্বরী)

এই-খেলায় পুরুষ তার ইচ্ছামতো ব্যবহার করতে পারে নারীর শরীরকে। শরীর মন সমস্ত কিছু দেওয়ার পরেও নারীটির মনে তবু সঙ্গোপনে রয়ে যায় 'এক তিল ফিরোজা সন্দেহ'। লিঙ্গ-পরিচয়ে নারী হওয়ার কারণে সারাজীবন ধরে মেয়েদেরকে বঞ্চিত হতে হয়। এই লিঙ্গবৈষম্য সম্পর্কে জেহাদ ঘোষণা করেন কবি। এরকম প্রত্যয়ের সঙ্গে নারীর আত্মপ্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা সারা বাংলা সাহিত্যে বিরল বলে মনে হয়। তিনি 'অপমানের জন্য ফিরে আসি' কবিতায় পুরুষকে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছেন—

'যুদ্ধরীতি পাল্টানোর কোনো প্রয়োজন নেই
তাই করমর্দনের জন্য
হাত বাড়াবেন না।
আমার করতলে কোনো অলিভচিক্কণ কোমলতা নেই।'

('অপমানের জন্য ফিরে আসি', বিমল হাওয়ার হাত ধরে)

উপরোক্ত কবিতায় নারীত্বের অপমান লাঞ্ছিত জীবনকে খোঁচা দেন লেখিকা; আসলে বারবার অপমান লাঞ্ছিত জীবনে ফিরে আসতে বাধ্য করার মধ্যে পিতৃতান্ত্রিক শোষণের ভয়াবহ রূপ ধরা দেয়— "ডাকেন মুঠোয় মরীচিকা রেখে/ মুখে বলেন বন্ধুতার বিভূতি-/ আমার মরীচিকার প্রয়োজন আছে।' নারীর ঠকে যাওয়াই যেন ধর্ম— "অপমানের জন্য বারবার ডাকেন/ ফিরে আসি/ ঝাঁপ খুলে লেলিয়ে দেন কলঙ্কের অজস্র কুক্কুর—/ আমার কলঙ্কের প্রয়োজন আছে।" নারী মানেই যেখানে কলঙ্কের লেপন; সেখানে নারীরা সামাজিক সুস্থতা পাবে কীভাবে?

মেয়েদের কোমলতা স্বাভাবিক, আবার তা অনেকটাই সমাজ আরোপিত। মেয়েদের শরীরের নরম, মোলায়েম যে রূপকে সমাজ চিহ্নিত করে দেয়, তাকে ভাঙতে চান কবি। কবিতা সিংহের কবিতায় নারী আপস করে না সামাজিক প্রথার সঙ্গে। পুরুষ নারীর শরীরকে ভোগের সামগ্রী বলে ভেবে এসেছে যুগ-যুগ ধরে। আবার তাকে নিয়ে কাব্য, সাহিত্য, শিল্প রচনা করেছে সেই পুরুষই। কিন্তু নারীশরীরের ভেতরে ঢুকলেও মনটাকে কোনোদিন দেখেনি তারা। সেইসব পুরুষের কাছে এই নারী জানতে চায়—

'তোমার শিরায় থাকে ক্লেদ রক্ত সহাবস্থানে
কাম ঘৃণা কাঁধে কাঁধ, ধাবমান থাকে ধমনীতে।

তুমি কি জানবে কোন রসায়নে নারীর শরীর
দুধ জল চিরে যায়, পরমহংসীর শুদ্ধতায়!
তুমি কি জানবে নারী কীভাবে নিষ্ফলা প্রেম
রাখে তার ধমনীতে'

('ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছা হলে', কবিতা পরমেশ্বরী)

নারীর প্রাত্যহিক জীবন সংগ্রাম তাঁর লেখার রসদ জুগিয়েছে। যদিও তাঁর দায়বদ্ধতা মানবতার কাছে; সর্বোপরি মানুষের কাছে। সমাজে লৈঙ্গিক বৈষম্য নিয়ে মেয়েলি ভাষা ভঙ্গিমা প্রকাশিত হলেও নারীর ব্যথা-বেদনা পাঠকসমাজের অন্তরে সমানুভব জাগিয়ে তোলে।

সহায়ক গ্রন্থ :

১. কবিতা সিংহ, শ্রেষ্ঠ কবিতা, দে'জ পাবলিকেশন, কলকাতা, ১৯৮৭
২. সুতপা ভট্টাচার্য, মেয়েদের লেখালেখি, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, জানুয়ারি ২০০৪
৩. তাপস রায়, কবিতা সিংহের কবিতা, সাতজন কবি, বসু কর্মকার (সম্পা), এবং মুশায়েরা, জানুয়ারি ২০০৪
৪. যোগেন্দ্রনাথ গুহ, বঙ্গের মহিলা কবি, দে'জ পাবলিকেশন, কলকাতা, জানুয়ারি ২০২৩